প্রথম আলো

তারিখ ..... 2 JAN 2010
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম.... ২......

কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

প্রথমবারের মতো পরীক্ষায় অংশ নিলেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ইতিহাসে এবারই প্রথম দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেলেন। গতকাল শুক্রবার জাতীয় দক্ষতামান বেসিক কোর্সে ১০ জন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পরীক্ষায় অংশ নেন। এ ছাড়া ১৫ জন শারীরিক প্রতিবন্ধীও এ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের এই পরীক্ষায় অংশ নিতে সহযোগিতা করেছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন ফর ডিজ্যাবেল অ্যাডভান্সমেন্ট (বোডা)। এবি ব্যাংকের সহযোগিতায় এ প্রতিষ্ঠানটি ১০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ছয় মাস করে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। গতকালের পরীক্ষায় তাঁরা কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন্ কোর্সে পরীক্ষা দেন।

বোডার দেওয়া তথ্য মতে, এবার ১০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে আটজন মেয়ে, বাকি দুজন ছেলে। তাঁরা দুজনই স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। মেয়েরা স্নাতক পড়াশোনা করছেন।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থী জিয়াউর রহমান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকল্যাণে এমএ পাস করেছেন। তিনি বলেন, পাস করার পর অনেক প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য গেলেও কেউ চাকরি দিতে চায়নি। আশা করছেন, এবার কম্পিউটারে সরকারি সনদ পাওয়ার পর হয়তো চাকরি পাওয়াটা সহজ হবে।

কারিগরি বোর্ড সূত্র জানায়, গত ৬ ডিসেম্বর দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীসহ প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণার্থীদের পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে সভা হয়। তাতে প্রতিবন্ধীদের (যাঁরা কাগজে লিখতে অক্ষম) আলাদা কক্ষে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা থাকার সিদ্ধান্ত হয়। পরীক্ষাকক্ষে পরিদর্শক প্রশ্ন পড়ে শোনাবেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষার্থীরা সফটওয়্যারের মাধ্যমে উত্তর লিখবেন। পরে উত্তরপত্র প্রিন্ট করে পরিদর্শক সই করে বোর্ডে পাঠিয়ে দেবেন। এ নিয়ম মেনেই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা পরীক্ষায় অংশ নেন।

মিরপুরে বোডার প্রধান কার্যালয়ে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন বোডার আইটি ইনচার্জ মো. নূরুল আলম এবং প্রশিক্ষক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আশিকুর রহমান।

নূরুল আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, এর আগেও বোডা থেকে ১০ জন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। কিন্তু কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষা নেওয়ার কোনো নিয়ম না থাকায় তাঁরা পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি। এবার বোর্ডের সহযোগিতায় নিয়মকানুন তৈরি করার ফলে তাঁদের জন্য সরকারি চাকরি পাওয়ার রাস্তা অনেকটাই সুগম হলো। তিনি জানান, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা কম্পিউটারের মনিটরের সাহায্য ছাড়া স্ক্রিন রিডিং সফটওয়্যারের সাহায্যে কম্পিউটার ব্যবহার করেন। প্রশিক্ষণের সময় তাঁদের ইন্টারনেটসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এম এ কাশেম *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রতিবন্ধীরা সব সময়ই অবহেলিত। অনেকেরই ধারণা ছিল, তাঁরা চোখে দেখেন না। এ কারণে ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন না। অথচ সুযোগ দিলে প্রতিবন্ধীরা অনায়াসেই পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেন—এবার তা-ই সত্য হলো। এম এ কাশেম জানান, সারা দেশ থেকে ১৮ হাজার পরীক্ষার্থী ৯২টি কেন্দ্রে ৩২টি কোর্সে পরীক্ষা দেন। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৫ জন। অষ্টম শ্রেণী পাস থেকে স্নাতকোত্তর (এমএ পাস) যে কেউ এ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেন।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ধারণাটি নতুন হলেও তৃণমূল স্তরের শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করতে এটি বিশেষ অবদান রাখবে, আশা করা যায়। গত ৩১ ডিসেম্বর যুগান্তর ও ব্র্যাকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও প্রাজ্ঞজনরা। সেখানে বিষয়টি স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের আগে শহরাঞ্চলে নার্সারি, কেজি ওয়ান ইত্যাদি শ্রেণীতে ভর্তির মাধ্যমে শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযোগী করে তোলার ব্যবস্থা আছে। তবে গ্রামাঞ্চল তথা বৃহত্তর জনপদে এ সুযোগ নেই বললেই চলে। সেই সুযোগ করে দিতে পারে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, ২০১১ সালের মধ্যে সব শিশুকে প্রাক-প্রাথমিকের আওতায় নিয়ে আসা যাবে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন। কারণ যেসব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই, সেখানকার অভিভাবকরা বুঝতে চাইবেন না স্কুলে যাওয়ার আগে ওই ধরনের শিক্ষার গুরুত্ব। দেশে এখনও ১৫ হাজার গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। সেসব গ্রামে বিদ্যালয় অবকাঠামো গড়ে না তুলে বিদ্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিকের ক্লাসরুম তৈরি কতটা যথার্থ হচ্ছে, তা ভেবে দেখতে হবে। এটা না আবার ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়ার মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়! আমাদের জাতীয় কর্মকাণ্ডে এরকম ঘটনার অনেক নজির আছে। একেক সরকার ক্ষমতায় এসে একেক রকম শিক্ষানীতি চালুর চেষ্টা করে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে শিক্ষাক্ষেত্রে। গ্রামের শিক্ষাবঞ্চিত শিশুরা অবহেলিতই থেকে যায়। নদীভাঙা উদ্বাস্তুদের জন্য চরাঞ্চলের দুর্গম গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে সবার আগে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে উচ্চশিক্ষিত নারীদের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা উচিত। তৃণমূল পর্যন্ত নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় শ্রেণীর নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার বিকল্প নেই। শিশুদের স্কুলে যাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার পাশাপাশি দরিদ্র পরিবারগুলোকে আর্থিক প্রণোদনা দেয়াও জরুরি। ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে তৃণমূলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণসহ মানবিক ও নৈতিক গুণাগুণের ওপরও গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়া মানসম্মত শিক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গুণগত মান সার্বিক বিবেচনায় ভালো নয়। গত বছর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় মফস্বল এলাকার শিশুরা যত ভালো ফলই করুক, জাতির শিক্ষা-আকাঙ্ক্ষা মেটাতে হলে নতুন চেতনার বিকাশ ঘটাতেই হবে। সেটা হতে পারে পাঠ্যসূচিতে অবাস্তব বিষয় পরিহার করে নতুন কিছু যুক্ত করে। সরকারের কাছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পাওয়ায় আমরা আশা করতে পারি, এক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন সম্ভব হবে।